ক্রোড়পত্র

ব্যাপকতার মধ্যে একটি কণা ঃ প্রসঙ্গ কান্তকবি

গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য

'মা, আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত'

দিব্য-কান্তি রূপের চার বছর বয়সের একটি শিশু জ্যাঠার কোলে বসে জ্যাঠার সঙ্গে সঙ্গে হাত তালি দিতে দিতে এই গানটি গাইতেন। জ্যাঠার কণ্ঠ বন্ধ হত, কিন্তু ওই শিশুটি জ্যাঠার কোল থেকে নেমে আপ্লুত হয়ে দু-হাত বাড়িয়ে স্পষ্ট উচারণে প্রাণ খুলে বার বার ওই দুটি লাইন গেয়ে চলতেন। জ্যাঠা গোবিন্দ নাথ সেন মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনতেন। রবীন্দ্র সমসাময়িক কবি রজনীকান্ত সেন। ভাব, বস্তু, প্রকাশ ভঙ্গিমায়, সব দিক থেকেই তিনি রবীন্দ্র বলয়ের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের পন্থা অনুসরণ করে রবীন্দ্রানুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। সংগীত রজনী কান্ত-র গানে সংগীতের অতিরিক্ত একটা 'লিরিক' ছিল যা রবীন্দ্র সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের থেকে মৌলিক, স্বাতন্ত্র এবং মাধুর্যের বাতায়নে ভরা।

রজনীকান্ত যখন বছর সাত-আটের তখন থেকেই রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর পাঠ মা মনোমোহিনী দেবীর কাছে শুনতেন এবং তা মুখস্থ করে আত্মীয় স্বজনদের কাছে আবৃত্তি করে শোনাতেন। স্মরণ শক্তি ছিল প্রখর। জ্ঞান, তত্ত্বকথা, বুদ্ধির দীপ্তি, উচ্চাঙ্গের সংযম- এগুলি তিনি পৈতৃক সম্পত্তি রূপেই পেয়েছিলেন। পিতা গুরুপ্রসাদ- বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, বৈষ্ণব পদাবলীর কিছু কিছু অংশ এবং জ্যাঠা গোবিন্দ নাথ শাক্ত পদাবলীর গান ও গল্প করে শোনাতেন। রজনীকান্তর জ্যাঠতুতো ভাই কালী কুমার সেন রজনীকান্তকে বাংলায় ছোটো ছোটো কবিতা রচনা করে পড়তে দিতেন। রজনীকান্ত শুধু দাদার কবিতাই পাঠ করতেন না, নিজে কবিতা লেখার উৎসাহ ও তাগিদ অনুভব করে দাদার হাতধরে এগিয়ে যেতেন। শোনা যায় কালীকুমারই রজনীকান্তর প্রথম কাব্যগুরু। ১২-১৩ বৎসর বয়সে তিনি Moral class book বইটি পড়তে পড়তে কিছু গল্প বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এমন কী চতুর্থ শ্রেণি থেকে বি.এ ক্লাস পর্যন্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ইংরাজী থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করার যে নির্দেশ থাকতো তা তিনি প্রায় পদ্যে লিখতেন। এই ব্যাপারে তাঁর পথ প্রদর্শক তাঁর বাল্য বন্ধু তারকেশ্বর চক্রবর্তী। এনট্রান্স পরীক্ষার কিছু দিন আগে রজনীকান্ত 'সতীর দেহ ত্যাগ' গদ্যটিকে সংস্কৃত ভাষায় পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন-

'ততঃশ্রুত্বা পির্তুবাক্যং পতিমুদ্দিশ্য দারুণম্।

রুরোদ শোক সন্তপ্তা সতী ত্রিভূবনেশ্বরী।
হা পিতঃ! কুত্র তত্তেজঃ প্রজাপত্যং সুমানিতম্।
ত্রৈলোক্যং বিদিতং যেন কুত্র তত্তোপসো বলম্।'

বন্ধু তারকেশ্বরের নেশা ছিল গ্রামে গ্রামে গিয়ে ভাসান গান, মঙ্গল কাব্যের গান, কবি গান আর পাঁচালি গান শোনার- যা রজনীকান্তকেও বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করত। এই বিষয়ে তারকেশ্বর চক্রবর্তী লিখেছেন-

'....রজনী আমার অনুকরণ করিতে এত তীব্রভাবে চেষ্টা করিত যে কেবল শারীরিক বল ভিন্ন আর সকল বিষয়েই সে আমার সমকক্ষতা লাভ করিয়াছিল। বরং কোনো কোনো বিষয়ে সে আমা অপেক্ষা কিছু কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছিল।'

শোনা যায়, তারকেশ্বরই না কি রজনীকান্ত-র শিক্ষাগুরু। গুরুর কাছ থেকে যে সঙ্গীত রজনীকান্ত শুনতেন তা শুদ্ধভাবে পরিবেশনও করতেন। এ সম্পর্কে এক রচনায় তারকেশ্বর লিখেছেন.....

'.....তখন সে অল্প অল্প ছোটো সুরে গান করিতে পারিত। ওই গান আমার নিকট বড়ই মিষ্ট লাগিত। আমি তখন সংগীত বিষয়ে কোনো শিক্ষা লাভ করি নাই। শুনিয়া শুনিয়া যাহা শিখিতাম তাহাই গাহিতাম। ..... পরে যখন একটু সংগীত শিখিতে লাগিলাম, তখনও বড়ো বড়ো তাল, যথা- চৌতাল, সুর ফাঁক প্রভৃতি, একবার করিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিতাম, তাহাতেই সে আয়ত্ত করিত এবং ঐ সকল তালের মধ্যে আমাকে সে এমন কুট প্রশ্ন করিত যে আমার অল্প বিদ্যায় কিছুই কুলাইত না।.....' আসলে রজনীকান্ত গান শুনতে ভালোবাসতেন। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে কিশোর রজনীকান্ত আগমনী বিজয়ার উপর গান রচনা করলেন-

'নবমী দুঃখের নিশি দুঃখ দিতে আইল।
হায় রাণী কাঙ্গালিনী পাগলিনী হইল।।
উমার ধরিয়া কর, কহে উমা আয়রে।
এমন করিয়া দুঃখ দিয়া গেলি মায়ে রে।।
সারাটি বয়স তোর মুখ পানে চাহিয়ে।
আসিবি রে আশা করি থাকি প্রাণ ধরিয়ে।
কত আশা করে থাকি পারি না তা বলিতে।
তিন দিনে চলে যাস পারি না তা পুরাতে।।
তোর মতো দয়াহীনা মেয়ে আমি দেখি নি।
ওমা, উমা ছেড়ে যাস- দেখে দিনঃ দুঃখিনী।'

তাঁর বাড়িতে দুর্গা পূজা হত। আর দুর্গা প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে আবেগে বিভোর হয়ে গান গাইতেন। বাড়ির অনুকূল পরিবেশের মধ্যে কাঙাল হরিনাথের গান এবং পারিবারিক সান্নিধ্য রজনীকান্তকে ভীষণ ভাবে মগ্ন করেছিল। গান ও তাৎক্ষণিক কবিতা রচনায় প্রতিভায় তিনি সর্বজন স্বীকৃত হয়েছিলেন। রাজশাহির প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুরেশ চন্দ্র সাহা-র মাসিক পত্রিকা 'উৎসাহ'-তে 'জনৈক জুনিয়ার উকিল' নামে কবিতা প্রকাশ করতেন।

যে কোনো অনুষ্ঠানে রজনীকান্ত তাৎক্ষণিক কবিতা রচনা করতেন। এমনকি গান রচনা করে তাতে সুর দিয়ে নিজে গাইতেন। তাঁর শব্দ সংযোজনার অভিনব বৈচিত্র ও বাক্‌ভঙ্গির প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য সকলকে অভিভুত করেছিলেন। এমনই একটি তাৎক্ষণিক গান রচনা করেছিলেন রাজশাহির নামকরা ঐতিহাসিক অক্ষয় মৈত্রের বাড়ি। সভাস্থলে সবাই মুগ্ধ হলেন। সকলে 'সাধু সাধু' বলে উঠেছিলেন সেদিন। সেই গান--'তব চরণ নিম্নে,.....

অদম্য গানের নেশা তাঁকে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল যে ওকালতি করতে রজনীকান্তর মনে তেমন উৎসাহ নেই। শরৎ কুমার রায়কে লেখা একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন- '.....আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালোববাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম আমার চিত্ত তাই লইয়াই জীবিত ছিল। সুতরাং আইনের ব্যবসায় আমাকে সাময়িক উদরান্ন দিয়াছে, কিন্তু সঞ্চয়ের অর্থ দেয় নাই।.....'

রজনীকান্তর তৃতীয় পুত্র ভূপেন্দ্র নাথ তখন ভীষণ অসুস্থ। তাবড় তাবড় চিকিৎসকের চিকিৎসা সত্ত্বেও তাকে বাঁচাতে পারলেন না। মৃত পুত্রের দিকে চেয়ে অপলক দৃষ্টিতে স্নেহশীল পিতা রজনীকান্তর বুক ফেটে গেল। করুণাময় ভগবানের চরণে স্তব্ধ নির্বাক চোখ দুটি স্থাপন করে তিনি গেয়ে উঠলেন-

'তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারই দু-নয়নে, তোমারি শোক বারি
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হা-হা রব।
তোমারি দেওয়া বিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া
আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি তো
আমারি বলে কেন ভ্রান্তি হল হেন
ভাঙ্গো এ অহমিকা, মিথ্যা গৌরব।'

কবি হিসাবে রজনীকান্ত-র কোনোদিন বিখ্যাত হবার লোভ ছিল না। এমনকি তিনি যশঃ প্রার্থীও ছিলেন না। তাঁর অজান্তেই তাঁর শুভাকাঙ্খী অক্ষয় কুমার মৈত্র রজনীকান্ত-

র কবিতা ও কিছু গানের সংগ্রহ ছাপার ব্যবস্থা করেন এবং নাম দেন 'বাণী'। সেবার বড় দিনের ছুটিতে ঐতিহাসিক অক্ষয় বাবুর সঙ্গে রজনীকান্ত কোলকাতায় এলেন। উঠলেন সাহিত্যিক জলধর সেনের বাড়িতে। সে সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার তরী সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। জলধর সেন তাঁর বাড়িতে সুরেশ চন্দ্র সমাজপতিকে আমন্ত্রণ জানালেন.। সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি ছিলেন একজন জাঁদরেল সাহিত্য সমালোচক। রজনীকান্ত-র গান ও কবিতায় মুগ্ধ সমাজপতি নিজেই রজনীকান্তর গান গুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। দু-দিন বাদে কলকাতার এলবার্ট হলে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। উপস্থিত স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তকে দেখলেন এবং রজনীকান্তর গান শুনে মুগ্ধ হলেন।

বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদে উত্তাল বাংলা...তিনি লিখলেন--

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'.....

গানটি সাংবাদিক সাহিত্যিক জলধর সেনের 'বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশ পায়। সেই সময় রজনীকান্ত গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে স্বদেশ ভাবনার গান গেয়ে হিন্দু-মুসলমান সবার কাছে স্বদেশ আত্মার আর্তি জানিয়ে লিখেছিলেন এমনই আর একটি গান--

'....আজ, এক করে দে সন্ধ্যা--নামাজ
মিশিয়ে দে আজ বেদ-কোরান'

কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নব গৃহ দ্বারোদঘাটন। সময়টা ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১ শে অগ্রহায়ণ। রজনীকান্ত তখন মূত্রনালির রোগে আক্রান্ত। বেশ অসুস্থ। তবু কোলকাতায় এলেন। জনস্রোতে ভরা সভায় সেদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং সভাপতিত্ব করেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে সেদিন রজনীকান্ত উদ্বোধনী সংগীত গাইলেন-

'লক্ষ লক্ষ সৌর জগৎ
নীল গগন গর্ভ
তীব্র বেগ ভীম মূর্তি
ভ্রমিছে মত্ত গর্বে.....'

গান শোনার পরপরই রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ এলো তাঁর সঙ্গে দেখা করার। রজনী কান্ত আপ্লুত হলেন। মুগ্ধ হলেন। কৃতজ্ঞ হলেন।

ভক্তিবাদ বাংলার একটি নিজস্ব ধারা। স্বদেশ ব্যাঙ্গোক্তি ছাড়া ভক্তি মূলক গানই রজনীকান্তর মূল কথা। ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ। দ্বিধাহীন নিরাসক্ত ব্যাকুলতায় শুধু পরম প্রেমময়ের কাছে আত্মসমর্পণ।

'কেন বঞ্চিত হব তব চরণে?

আমি, কত আশা করে বসে আছি
পাব জীবনে, না হয় মরণে!'

কবি রজনীকান্ত-র গান, বাংলাদেশে আজও বাংলা গানের ভাণ্ডারে এক কালজয়ী অমূল্য সম্পদ। তাঁর গানের কথা ও সুরের রসধারায় কান্তকবির গান মানুষের মনের গভীরে খুব সহজেই পৌঁছে যেত। শ্রোতাকে আবিষ্ট করে তুলে তাকে অনির্বচনীয় আনন্দ দিত। তাই সেদিন কান্ত কবির 'আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ, গর্ব করিতে চুরি.....'- গানটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অনুরাগী মৃত্যু পথ যাত্রী কান্তকবি রজনীকান্তকে পত্র পাঠিয়ে লিখেছিলেন-

'..... সেদিন আপনার রোগ শয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি মাংস স্নায়ুপেশি দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম।..... শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই, পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধুলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে অগ্নি আরো তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্য প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি মাংস ও ক্ষুধা তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত-বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য।.....

সিদ্ধিদাতা তো আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই তো তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন- আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত তো তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ....ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীর ভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন আজ আপনার জীবন সংগীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা সংগীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।'

তথ্যসূত্র ঃ
১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। রজনীকান্ত সঙ্গীত সমগ্র- সুনীলময় ঘোষ